বিক্রমশিলা

শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতীর ইতিহাসের অধ্যাপক,

"নালন্দা" প্রণেতা

শ্রীফণীন্দ্রনাথ বসু, এম, এ

প্রকাশক—

শ্রীসুরেশচন্দ্র বর্ম্মণ

আর্য্য পাবলিশিং হাউস

ব্রাঞ্চ—পি ৫৬, রসারোড, সাউথ

কলিকাতা।

প্রকাশক
শ্রীসুরেশচন্দ্র বর্ম্মণ
আর্য্য পাবলিশিং হাউস
ব্রাঞ্চ—পি ৫৬, রসারোড্ সাউথ
কলিকাতা।

কলিকাতা ৯৩।১এ বহুবাজার ষ্ট্রীট
চেরি প্রেস হইতে
আর, কে, রাণা কর্ত্তৃক
মুদ্রিত।

উৎসর্গ

ভাই রাজেন,

তোমার কথায় তোমায় গল্প শোনাবার জন্যে এটী লিখেছিলাম। তাই তোমার স্মৃতি এর সঙ্গে জড়িত রাখবার জন্যে বইখানি তোমারই উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করলাম।

ইতি

তোমার মেজদাদা।

নিবেদন

আমার অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় ডাক্তার শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, এম, এ, পি, এচ, ডি মহাশয় এই বইটীর ভূমিকা লিখে দিয়ে আমাকে অনুগৃহীত করেছেন। আর প্রচ্ছদপটের পরিকল্পনা করে দিয়েছেন আমার বন্ধু প্রসিদ্ধ শিল্পী শ্রদ্ধেয় শ্রীনন্দলাল বসু। এজন্যে তাঁদের আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বিশ্বভারতী
শান্তিনিকেতন
দুর্গাঅষ্টমী ১৩৩০

শ্রীফণীন্দ্রনাথ বসু

ভূমিকা

(অধ্যাপক শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, এম-এ, পি-আর-
এস, পি-এচ্-ডি, লিখিত।

আমাদের দেশে ইতিহাসের আদর নাই---প্রাচীনকালেও ছিল না এখনও বড় একটা নাই। অথচ আমাদের দেশেই ইতিহাসের প্রচার সব চেয়ে বেশী দরকার। কারণ আমাদের একটা গৌরবময় অতীত ছিল এবং আমাদিগকে মানুষ হইতে হইলে তাহা জানিতে ও বুঝিতে হইবে। ক্ষুদ্র বৃক্ষ শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া যতই বৃহদাকার হউক না কেন মূলের সহিত সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইলেই তাহা মরিয়া যায়। জাতিও উত্তরোত্তর যতই পরিণতি লাভ করুক না কেন মূল প্রকৃতির সহিত সংযোগ না রাখিলে তাহা বাঁচিতে পারে না। এই মূল প্রকৃতি কি, কেবলমাত্র ইতিহাস পাঠেই আমরা তাহা জানিতে পারি।

কিন্তু নীরস ঘটনাপূর্ণ ইতিহাস কেহ পড়িতে চায় না। তাই ইহাকে সরস করিয়া লোকের সম্মুখে উপস্থিত করিতে হয়। সুতরাং যে যুগে যে প্রকারের সাহিত্য জনসাধারণের প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে ইতিহাস তাহারই ছদ্মবেশে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। যখন কাব্যের আদর ছিল ইতিহাস তখন কাব্যের আকারে দেখা দিয়াছে। এখন গল্প, নাটক ও উপন্যাসের যুগ তাই ঐতিহাসিক গল্প নাটক ও উপন্যাসের ছড়াছড়ি।

আমার পরম স্নেহাস্পদ ছাত্র শ্রীমান্ ফণীন্দ্রনাথ বসু গল্পের আকারে ইতিহাসকে জীবন্ত সত্য করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি বিশ্ববিশ্রুত বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয় ও তিব্বতে ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব এই দুইটি বিষয় উপলক্ষ্য করিয়া একটি অনতি-বৃহৎ গল্প লিখিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে একখানি গল্পের বই লিখিয়া তিনি যে যশঃ অর্জ্জন করিয়াছেন আলোচ্য পুস্তিকাখানি তাহা অক্ষুণ্ণ রাখিবে ইহাই আমার বিশ্বাস।

আলোচ্য পুস্তকখানি নিঃসংশয়ে অল্প বয়স্ক বালক বালিকা-গণের হাতে দেওয়া যাইতে পারে। দুঃখের বিষয় খুব কম ঐতিহাসিক নাটক গল্প ও উপন্যাস সম্বন্ধেই এ কথা খাটে। এই হিসাবে শ্রীমান ফণীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক প্রচেষ্টা সফল হইয়াছে বলিতে হইবে। বাল্যকাল হইতেই গল্পচ্ছলে ঐতিহাসিক তথ্যগুলি জানিতে পারিলে পরিণামে বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা। এই নিমিত্ত বালকগণের পাঠোপযোগী ঐতিহাসিক গল্পের বহুল প্রচার হওয়া বাঞ্ছনীয়। সুতরাং "বিক্রমশিলা" জনসমাজে আদৃত হইবে এরূপ আশা করা যাইতে পারে।

রমণা, ঢাকা
৩রা ভাদ্র, ১৩৩০। } শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

বিক্রমশিলা

[এক]

রাজসভা লোকজনে বেশ গম গম করছে। পাত্র মিত্র মন্ত্রী অমাত্য সভাসদ—সকলেই হাজির রয়েছেন। কিন্তু মহারাজাধিরাজ (১) এখনও আসেন নি, সকলে ব্যস্ত সমস্ত হয়ে তাঁর প্রতীক্ষা করছে। অন্যদিন রাজা এতক্ষণ রাজসভায় এসে পড়েন, আজ নিশ্চয়ই এমন কোন কারণ ঘটেছে যাতে তাঁর আসার বিলম্ব হচ্ছে!

হঠাৎ দুন্দুভি বেজে উঠ্‌ল, বন্দীরা জয় গান করে উঠল।

সকলে বুঝল যে রাজা আসছেন, তাঁর আগে পিছনে অস্ত্রধারী সেনা তাঁর অঙ্গ রক্ষা করে আস্‌ছে। সভাসদদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিল, সবাই সসম্ভ্রমে উঠে তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা করলেন। সবাই দেখল—রাজা যেন আজ কিসের চিন্তায় ব্যস্ত।

সিংহাসনে বসেই রাজা ডাকলেন—"মন্ত্রি!"

প্রধান মন্ত্রী তাড়াতাড়ি উঠে এসে বল্লেন—"কি আজ্ঞা, মহারাজ।"

---

(১) এই মহারাজাধিরাজ আমাদের বাংলা মুলুকের কোন স্বাধীন নরপতি নন, তাঁর রাজ্যের এলাকা ছিল একেবারে হিমালয়ের ওপারে তিব্বত মুলুকে। তাঁর সময় আমরা এক হাজার বছর আগে ফেলতে পারি।

গম্ভীর কণ্ঠে রাজা জিজ্ঞাসা করলেন—"আমার খুড়োর মৃত্যুর কারণ কি জান?"

"জানি বৈ কি, মহারাজ, আমরা হচ্ছি পুরাণ আমলের লোক, আমরা জানব না? আমাদের মহারাজ যাচ্ছিলেন সেবার ভারতে, পথে তাঁর যুদ্ধ হয় কোন্ এক অজানা রাজার সঙ্গে। সেই যুদ্ধের ফলে মহারাজ পরাজিত হয়ে বন্দী হন। তখন সেই পাষণ্ড রাজা কি কর্‌ল জানেন? সেই বিধর্ম্মী রাজা তাঁকে মুক্তি দিতে রাজী হল কেবল এক কড়ারে—যদি আমাদের মহারাজ বৌদ্ধধর্ম্ম ছেড়ে তাদের বিধর্ম্ম গ্রহণ করতে সম্মত হন। সেই কড়ারে রাজী হতে মহারাজ অস্বীকার কর্‌লেন, সেই অস্বীকারের দাম তাঁকে দিতে হল, তিনি স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে বরণ করে নিলেন। (২)

"কিন্তু, মহারাজ ভারতে যাচ্ছিলেন কেন?"

"মহারাজ স্বপ্ন দেখেছিলেন যে ভারতে এমন একজন মহা-পণ্ডিত আছেন, যিনি তিব্বতে এলে তিব্বতের ভাগ্য প্রসন্ন হবে, তিব্বতের ধর্ম্মের উন্নতি হবে। তাই তাঁকে অভ্যর্থনা করে আন্‌তে নিজেই যাচ্ছিলেন—পথে এই বিপদ হয়।"

এ কথা শুনে মহারাজ বল্লেন—"আমিও কাল এক স্বপ্ন

(২) এর আগে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবেশ করে। তিব্বতের রাজা স্রোণ সাং গামপো নিজের চীনা ও নেপালী বৌদ্ধ রাণীদের প্রভাবে নিজে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন ও ভারত থেকে পণ্ডিতদের ডেকে পাঠান তিব্বতে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রচার করবার জন্তে।

দেখেছি। স্বপ্নে স্বর্গীয় মহারাজ দেখা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"তুমি ত আমার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হয়েছ, কিন্তু আমার আত্মার পরিতৃপ্তির জন্য কি করছ ? আমার আত্মা যে কেবল অস্থির হয়ে বেড়াচ্ছে, কিছুতেই শান্তি পাচ্ছে না।" আমি উত্তর দিলুম—"তার ব্যবস্থা আমরা করছি। আমরা সেনা সংগ্রহ করেছি, সেই রাজার বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্যে, তাকে উপযুক্ত সাজা দেবার জন্যে।" এ কথা শুনে তিনি যেন আরও চঞ্চল হয়ে উঠে বল্লেন—"না, না, প্রতিশোধ আমি চাই না, তাতে আমার আত্মা তৃপ্তি পাবে না, শান্তি পাবে না।" আমি তখন বল্লাম—"তবে আপনার ইচ্ছা কি ? আমাদের কি করতে বলেন ?" তিনি গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলেন—"যদি আমার আত্মার কল্যাণ কামনা কর, তবে যে কাজ আমি সুরু করে-ছিলাম, সেটা শেষ কর। তাতে আমার আত্মা প্রকৃত তৃপ্তি পাবে।" এই বলে স্বর্গীয় মহারাজ অদৃশ্য হয়ে গেলেন, স্বপ্নও ভেঙে গেল। সকালে উঠে এই স্বপ্নের কথাই প্রথমে মনে হয়েছে। তাই আজকের দরবারেরও প্রথম কাজ হবে—সেই স্বপ্নের নির্দ্দিষ্ট কাজটা সাধন করা। মন্ত্রি, সে কাজটা কি বুঝতে পেরেছ—যা মহারাজ ঈঙ্গিত করে গেছেন ?"

"বুঝেছি মহারাজ, সেই পণ্ডিতকে এদেশে নিয়ে আসা।"

"তা হলে এখন কি কর্ত্তব্য ঠিক কর। কাকে এ কাজের ভার দিয়ে পাঠান যায় ?"

"সেই ত সমস্যা, মহারাজ ?"

"কেন ?"

"ঐ যে প্রকাণ্ড অজগর সাপের মত পড়ে আছে হিমালয় পাহাড়টা, সেইটা পার হওয়াইত মহা সমস্যা। কারও এমন ভরসা হয় না যে বরফের সঙ্গে একলা লড়াই করতে যাবে। আর পথটা তো সোজা নয়, কতদিন কত মাস যে লেগে যাবে এটা পার হতে তার কি ঠিক আছে। তাই এ অজানা অচেনা পথে কেউ যেতে চায় না।"

"তবে কি বলতে চাও, এ দেশ থেকে কেউ ভারতে যায় নি, বা ভারত থেকে কেউ এ দেশে আসে নি ?"

"তা যাবে না কেন, এখান থেকে অনেক দূত গেছে ভারতে, আবার ভারত থেকে পণ্ডিত পদ্মসম্ভব ও অন্য লোকেরাও এসেছেন। আর আমাদেরই রাজ্যে একজন আছেন, যিনি কিছু দিন আগে ভারতে গিয়েছিলেন।" (৩)

"তবে তাকেই ডেকে পাঠাও না এখনি।"

"যে আজ্ঞা মহারাজ।"

অমনি রাজার লোক লস্কর ছুটল—সেই যাত্রীকে ডেকে আন্‌তে। সে বেচারী নিজের ছোট কুটীরে বসে খাচ্ছিল, হঠাৎ তার বাড়ীর সামনে পাগড়ীবাঁধা বড় বড় সিপাই শাস্ত্রীকে দেখে চমকে উঠ্‌ল। সে বেচারী ত ভাবলে—না জানি কি ব্যাপার হয়েছে, সে জোড় হাতে জিজ্ঞাসা করলে—"কি হুকুম।"

(৩) এই তিব্বতির নাম—Nag—Tcho—

সবাই সমস্বরে বলে উঠল—"চল্, রাজা মশাই তোকে ডেকেছেন।"

সে ব্যস্ত সমস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"কেন ? কি জন্যে ?"

লোকগুলো ত হেসেই আকুল—রাজা তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন, সেই না কত অনুগ্রহ, তার আবার, কেন, কি জন্যে! লোকটা আহাম্মক নাকি ?

বেচারী এমনি ভাবে আহাম্মক সেজেই বল্লে—"আচ্ছা, দাঁড়াও, আমি আগে খেয়ে নি, তারপর যাব।"

সবাই কিন্তু চোখ রাঙিয়ে বল্লে—"আরে না, না, খেতে আর হবে না। রাজার হুকুম এখ্খুনি যেতে হবে। চল্ চল্।"

লোকটা তখন গেছে রেগে, একটু গরম হয়ে বল্ল—"দেখ, তোমরা রাজার সিপাই হও আর যাই হও, বল্‌ছি—বাঁদরামি কোরো না। আগে আমাকে খাওয়াটা শেষ করতে দাও, তারপর যাব। নয়ত যাও, বল গে তোমাদের রাজাকে এখানে আসতে, আমি যেতে পারব না।"

তখন রাজার সিপাইরা বুঝল যে—এ লোকটা নিতান্ত আহাম্মক বা বোকা নয়। এ আবার উল্টে সাতকথা শুনিয়ে দেয়! অগত্যা, তারা তার কথাতেই রাজী হয়ে বল্লে—"আচ্ছা আচ্ছা খেয়ে নে।"

সেই যাত্রী রাজ সভায় পৌঁছতেই রাজা তাঁকে খুব সমাদরের সঙ্গে অভ্যর্থনা করলেন, আর বল্লেন—"আসুন এখানে পণ্ডিতজী।"

রাজারই কাছে তাঁর আসন দেওয়া হল, তিনি সেখানে বসলেন। সিপাইগুলো ত অবাক্,—যাকে এমন হতশ্রদ্ধার সঙ্গে ব্যবহার করেছে, যাকে আহম্মক, বোকা ভেবেছে, সেই লোকটারই এত সম্মান !

রাজা তাঁকে বল্লেন—"দেখুন পণ্ডিতজী দেশের ডাক এসেছে আপনি কি সেই ডাকে সাড়া দিতে রাজী আছেন ?"

পণ্ডিতজী উত্তর দিলেন—"আমি মায়েরই ছেলে, মা ডাকলে ছেলে কি না গিয়ে থাকতে পারে ?"

"তবে শুনুন, দেশ আপনাকে বল্‌ছে একবার হিমালয়ের ওপারে যেতে হবে।"

"হিমালয়ের ওপারে ! কেন ?"

"হিমালয়ের নাম শুনে বুক কাঁপছে নাকি ভয়ে !"

"না, ভয় আর কি ? সেত আমার চেনা পথ। কেন যেতে হবে ?"

"মগদ দেশের মহা-উপাধ্যায় পণ্ডিত দিপঙ্করকে (৪) নিমন্ত্রণ করবার জন্য। তাঁকে ডাকবার জন্য কাল স্বর্গীয় মহারাজ আমায় স্বপ্নে আদেশ করেচেন।"

"দেশের এত লোক থাকতে ডাক যখন আমার কাছে এসে পৌঁচেছে তখন আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন বলতে হবে। কিন্তু যদি

(৪) পণ্ডিত দীপঙ্কর সম্বন্ধে Waddels' Lamaism ও ৺শরৎচন্দ্র দাসের Indian Pandit in the land of snow দ্রষ্টব্য।

এই দুর্গম পথটা আমাকে একলা প্রাণটী হাতে করে নিয়ে যেতে হয়, তবেই বলতে হবে—

"যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
তবে একলা চল রে।
একলা চল, একলা চল
একলা চল রে। **
যদি গহন পথে যাবার কালে
কেউ ফিরে না চায়
তবে পথের কাঁটা
ও তুই রক্তমাখা চরণ তলে
একলা দলরে।"

রাজা ব্যস্ত হয়ে বল্লেন—"সে কি, আপনি একলা যাবেন কেন? আপনি যাবেন রাজপ্রতিনিধি হয়ে বিক্রমশীলার মঠে যেখানে মহাপণ্ডিত দীপঙ্কর নিজের সাধনায় মগ্ন আছেন! আপনার সঙ্গে লোক লস্কর সিপাই শান্ত্রী সব দোব, আপনি তাদের কর্ত্তা হয়ে ভারতে যাবেন। পাথেয় যা কিছু দরকার, সে সব ও উপহারের জন্য টাকা কড়ি সব রাজকোষ থেকে পাবেন। আর মন্ত্রী যানের ও সব ব্যবস্থা করে দেবেন।"

এই বলে রাজা একটু চুপ করলেন, ফের বলতে আরম্ভ করলেন—"পণ্ডিতজী, আপনার ওপর গুরুভারই অর্পণ করা হয়েছে, আশা করি আপনি ভগবান তথাগতের কৃপায় সে কর্ত্তব্য পালন করতে পারবেন। আপনি মহাভিক্ষু দীপঙ্করের সঙ্গে দেখা

করে বলবেন যে—ভোট দেশে তাঁর আসার একান্তই দরকার। ভগবান বুদ্ধের পবিত্র ধর্ম্মের এমন বিকৃতি এদেশে ঘটেছে যে তিনি না এলে তিব্বতের উদ্ধারের আর কোন উপায় নেই। আর তাঁকে এই টাকা যৌতুক দেবেন। মোট কথা যে কোন উপায়ে তাঁকে আনা চাই।”

সেই পণ্ডিতজী বল্লেন—“মহারাজ, আমি চেষ্টার ক্রুটী করব না। তবে জানি না কতদূর কৃতকার্য্য হতে পারব। আমি মহাভিক্ষু দীপঙ্করকে চিনি, তিনি যে সহজে বিক্রমশিলা ছেড়ে এই পাহাড়ে দেশে আসবেন মনে হয় না। তবে আমি চেষ্টা করব, ভগবান্ বুদ্ধ আমার সাহায্য করুন।”

[দুই]

জনকতক লোক পথ বেয়ে চলেছে—সেটী গাঁয়ের মেঠো পথ নয়, তার আশে পাশে প্রকৃতি নিজের সৌন্দর্য্যরাশি ফুটিয়ে রাখে নি। সেটা একটা পাহাড়ে পথ, কোথাও উঁচু, কোথাও নীচু, আবার কোথাও একেবারে খাড়া হয়ে উঠেছে, সেখানে একটু অন্যমনস্ক হলেই বা পা ফস্‌কালেই—একেবারে ভূমিশয্যা নিতে হয়।

তারা হচ্ছে যাত্রী, লোক লস্কর নিয়ে ভারতের দিকে যাচ্ছে রাজার আদেশে। দূর থেকে তারা দেখতে পাচ্ছিল হিমালয়ের বিরাট নগ্ন সৌন্দর্য্য-মূর্ত্তি। সেই সৌন্দর্য্যের সামনে আপনা থেকেই তাদের মাথা নত হয়ে আসছিল।

যাত্রা করবার সময় তাদের মন বাড়ীর স্মৃতির ব্যাথায় ভরে উঠেছিল, সেই বেদনাকাতর স্মৃতি নিয়েই তারা যাত্রা করেছিল, আর বেরবার সময় তারা হয় ত গেয়েছিল—

"আমাদের যাত্রা হল স্বরু, ওগো কর্ণধার।"

সারাদিন পাহাড়ে পথ ভেঙ্গে, সন্ধ্যার সময় যাত্রারা সব ক্লান্ত হয়ে পড়ল। পথে বিপদ যথেষ্ট, তাই তারা একটা নির্জ্জন স্থান খুঁজে নিলে নিরাপদ হবে ভেবে। সেইখানেই তাঁবু পড়ল। তখন সবাই খাবারের যোগাড় করতে লাগল। খাওয়া দাওয়া শেষ হলে তাঁবুর মধ্যেই সবাই ঘুমুল। ঘুমবার আগে তারা তাঁবুর চারিদিকে আগুন জ্বেলে দিলে যাতে বন্যপশু তাদের আক্রমণ করতে না পারে।

অনেক রাত হয়েছে, সবাই ঘুমে মগ্ন, এমন সময় তাঁবুর মধ্যে কিসের যেন শব্দ শোনা গেল। মনে হল কে যেন পাথর ঠুকে আগুন জ্বালবার চেষ্টা করছে। সেই শব্দ শুনে একজন যাত্রীর ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে লোকটা আবার একটু ভীরু, তাই তার সাহস হল না যে উঠে দেখে—ব্যাপারটা কি। শেষে সে পাশের লোককে ডাক্‌ল—"ওহে ভাই ?" সে ঘুমের ঘোরে বল্ল—"কেন, কি হয়েছে ?"

সে বল্লে—"ঐ শোন, কিসের শব্দ।"

"কিসের আবার ? নিশ্চয়ই ভূতের বা প্রেতের।"

যেই একথা বলা লোকটী কম্বলটা টেনে মুড়ি দেবার চেষ্টা করল। অন্য লোকটী ব্যাপার সুবিধাজনক নয় ভেবে, আস্তে আস্তে উঠে পড়ল। উঠে চুপি চুপি আর কজনকে ডাকল আর যারা তাঁবুর মধ্যে ঢুকেছিল সেই লোকগুলোকে হঠাৎ আক্রমণ করল। তারা আর কেউ নয়—পাহাড়ী ডাকাতের দল, যাত্রীদের কাছে টাকা কড়ি আছে ভেবে তাঁবুর মধ্যে ঢুকেছিল। হঠাৎ আক্রান্ত হয়ে, ডাকাতরা শীঘ্রই ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাল। এই রকমে সেদিনকার রাত্রি প্রভাত হল।

পরদিন ঊষার আলোকের সঙ্গে সঙ্গে তারা আবার যাত্রা করল—এ যেন কোন্ নিরুদ্দেশ্যের খোঁজে যাত্রা। তাদের গতির বিরাম নেই, পাথরের পথ ভেঙ্গে চলেছেই, পথের হাজার রকম দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে করতে তারা চলেছে। এ দুঃখের ব্রতকে তারা যে স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়েছে—দেশের মুখ উজ্জ্বল করবার

জন্যে। তাই তারা এতটুকু ভীত, এতটুকু সন্ত্রস্ত বা এতটুকু ক্লান্ত নয়।

যাত্রীরা তখনই প্রমাদ গন্‌ল, যখন কোয়াসায় চারিদিক্ ঢেকে ফেলবার উপক্রম করল, কারণ এতে পথ হারাবার সম্ভাবনা খুব বেশী হল। তার ওপর যখন বরফ পড়তে সুরু হল, তখন সেই সরু পাহাড়ে পথটা একেবারে সাদায় সাদা হয়ে গেল। দুপাশে উঁচু পাহাড়, আর মাঝখানে সেই সরু পথ, তাতেও বরফ পড়ে পথচলাকে কঠিন থেকে কঠিনতর করে তুল্‌ল। লাঠির ওপর ভর করে যাত্রার দল চলতে লাগল, কারণ সামনের দিকে তাদের যে যেতেই হবে, তারা পিছু ফিরতে পারে না, তাতে লজ্জা তাদের সাঙ্গনা হবে। তাই তারা জীবন পণ করে চলেছে জল ঝড় মাথায় করে, পাহাড় পর্ব্বত অতিক্রম করে, সব বিপদকে তুচ্ছ জ্ঞান করে।

এই সব বিপদ মাথায় নিয়ে তারা ভগবান্ বুদ্ধদেবকে স্মরণ করতে করতে বল্‌তে লাগল—

"জয় হোক জয় হোক নব অরুণোদয়
পূর্ব্বদিগঞ্চল হোক জ্যোতির্ম্ময়।

* * *

এস মৃত্যুঞ্জয় আশা
জড়ত্ব নাশা
ক্রন্দন দূর হোক্, বন্ধন হোক্ ক্ষয়।"

কিন্তু বিপদ ঘনিয়ে এসেছে, সেই দুরন্ত জল হাওয়া তাদের

দিগ্‌ভ্রম করিয়ে দিলে। একে বরফে সারা পথটী ঢাকা, তার উপর কুজ্‌ঝটিকা, যাত্রীর দল ক্রমশঃ বিপথে অগ্রসর হতে লাগল। শেষে তারা এমন এক জায়গায় এল, যেখানে মৃত্যু তাদের সাদরে আহ্বান করতে লাগ্‌ল। অগ্রসর হতে হতে প্রথম ২।৪ জন লোক কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল যে তার কোন চিহ্নই পাওয়া গেল না, কেবল একটা ভীষণ শব্দ হল। দলের সর্দ্দার তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে দেখলেন যে তারা এমন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে, যেখান থেকে অগ্রসর হওয়া মানেই মৃত্যু। সেখানে পাহাড়টী ঠিক খাড়া ভাবে নেমেছে, যেমনি উপর থেকে পা—বাড়ান অমনি একেবারে নীচের জলে পড়া। এই দেখে সর্দ্দার চিন্তিত হয়ে পড়লেন। সবাইকে ডেকে তিনি বল্লেন—

"আজ এখানেই আমাদের যাত্রা স্থগিত রাখতে হল। সামনের দিকে গিয়ে মৃত্যুকে আমরা ডাকতে চাই না। তার চেয়ে, তোমাদের মধ্যে থেকে তিন দল লোক যাও, গিয়ে খোঁজ আসল পথ যেটা আমরা ফেলে এসেছি, সেটা কোন্ দিকে। ততক্ষণ আমরা এখানে আহারের জোগাড় করি।"

অমনি তিনদিকে তিন দল বেরিয়ে পড়ল—পথের সন্ধানে। এদিকে আর সব যাত্রীরা খাবার জোগাড় করতে লেগে গেল। পাহাড়ের এদিক ওদিক ঘুরে কেউ দু'চারটে বুনো ফল, কেউ বা দু'চারখানা কাঠ জোগাড় করতে লাগল, কেউ বা তীর ধনুক দিয়ে পাখী আর হরিণ শিকার করে নিয়ে এল। তারপর আগুন ত চাই? কি করা যায়? দুখানা শুক্‌নো দেখে কাঠ নিয়ে

একজন ঘসে ঘসে তা থেকে আগুন বার করে আগুন ধরাল। সেই আগুনে পাখী গুলো আর হরিণের মাংস সিদ্ধ করে তাই তারা মনের আনন্দে খেল। যে তিন দল পথের সন্ধানে বেরিয়েছিল তাদের জন্যে কিছু খাবার রেখে দিলে।

ক্রমে ক্রমে দুটো দল ফিরে এল—কেবল ফিরল না যারা দক্ষিণ দিকে গিয়েছিল। বেলা ক্রমশঃ বয়ে গেল, তবুও তাদের দেখা নেই। শেষে সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময় তারা ফিরে এল।

"কি খবর তোমাদের ?" জিজ্ঞাসা করতেই তারা বল্লে—

"আমরা ত দক্ষিণ দিকে অনেক দূর গেলুম। শেষে এক জায়গায় দেখি একটা লোক গাছের তলায় কি করছে। আমরা তার কাছে এলে, আমাদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করলে—"ওহে, শুনচ বাপু ?"

তার কোন জবাব না পেয়ে, আর একজন বল্লে—"কিহে কানে কম শোন না কি ?"

তবু কিন্তু কোন উত্তর পাওয়া গেল না দেখে, আমি যেমনি "লোকটা কালা না কি !"—বলে তার হাত ধরতে গেছি, অমনি সে খুব জোরে মারলে এক ছুট। আমরাও তার পাছু নিলুম। একে এই পাহাড়ে দেশ, তাতে আবার এই ছুটোছুটি, আমরা ত হাঁপিয়ে পড়লুম। ভাবলুম—এ আবার কি আপদ! হাঁপাতে হাঁপাতে এসে দেখি—সে লোকটা দাঁড়িয়েছে, আর জন কতক লোককে সে কি বল্‌ছে। আমরা সেই লোকগুলোর কাছে এলুম, আশা হল—যদি এদের কাছ থেকে কোন খবর পেতে

পারি। ও বাবা—তারা আবার তার বাড়া। সে যেন বাঁশের চেয়ে কঞ্চি শক্ত। কাছে আসতেই তারা বল্লে—"এস ত বাছাধনরা, একে একলা পেয়ে যে খুব অত্যাচার করছিলে এর ওপর। এসো দেখি গায়ে কত জোর হয়েছে।"

আমরা ত অবাক্! এরা বলে কি? আমরা বল্লুম—"সে কি বলছ? আমরা একে একটা কথা জিজ্ঞাসা করলুম, তাতে ও লোকটা কোন জবাব না দিয়ে একেবারেই কিনা ছুট্ দিলে।"

"ভারি সাধু সাজ্‌ছ না! সেই জন্যেই ওর পেছনে ছুট দিচ্ছিলে তোমরাও!"

"এই বলে তারা আমাদের মারতে এল, আমরাও ছেড়ে কথা কইলাম না। শীঘ্র তাদের পালাতে হল, কেবল একজন পারলে না পালাতে, তাকে ধরে জিজ্ঞাসা করলুম—"ওহে দেখ, যদি আমাদের কথার ঠিক জবাব দাও, তবেই তোমাকে ছেড়ে দোব।"

সে বল্লে—"দোব, কি কথা?"

আমরা বল্লুম—"দেখ, আমরা যাচ্ছিলুম ভারতে, মাঝখানে এসে পথটা গেছি হারিয়ে। তুমি বলতে পার ভারতে যাবার পথ কোন্‌টা?"

সে বল্লে—"পারি বৈকি। এই একেবারে সোজা দক্ষিণ দিকে যাও, তা হলেই নেপালে পৌঁছে যাবে।"

"তার কাছ থেকে পথের সন্ধান পেয়ে, আমরা এই সবে ফিরছি।"

———

[তিন]

যাত্রীরা সব বসে বিশ্রাম করছে। তারা ঠিক গোল হয়ে বসেছে, মাঝখানে আগুন জ্বলছে, আর তারা বসে বসে দেশের নানা রকম গল্প করছে। তাদের মধ্যে একজন বল্লে—"মজাটা মন্দ হচ্ছে না!"

আর একজন বল্লে—"মজাটা কিসের? দিনরাত পথ চলতে চলতেই প্রাণান্ত, তার আবার মজা?"

"সে কথা বলচি না। এই দেখ না, কেমন আমাদের রথ দেখা, কলা বেচা দুই-ই হচ্ছে।"

সবাই উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"কি রকম, শুনি?"

"এই দেখ না, আমরা যাচ্ছি রাজার খরচে, এদিকে মাঝখান থেকে আমাদের তীর্থ ভ্রমণও হয়ে যাবে।"

"দূর পাগল, এদিকে আবার তীর্থ টীর্থ কোথায়?"

"তোমার ঘটে বুঝি এক কাণা কড়া বুদ্ধিও নেই। যাও, ফের গিয়ে লামার কাছ থেকে ভূগোলটা পড়ে এসো। জাননা আমরা যাচ্ছি কোথায়?"

"আরে ভাই, সে কথা জানবার দরকার কি? রাজার সিপাই আমার কাছে এসে বল্লে—এই যাবি? অনেক টাকাকড়ি পাবি। যেই শোনা অমনি বাড়ী ছেড়ে বেইরে পড়া।"

"তা না হলে আর তোমার এই অবস্থা।"

তখন আর সব লোকগুলো বল্লে—"যাক্ ভাই ওর কথা,

ওত লামার চেয়েও বিদ্বান্। বল দেখি পথে কি কি তীর্থ আমরা দেখেতে পাব।"

"যদি আমরা নেপালের মধ্যে দিয়ে যাই, তা হলে ভগবান্ তথাগত যেখানে জন্মেছিলেন—সেই লুম্বিনী উদ্যান, যেখানে তিনি বাল্যকাল কাটিয়েছিলেন সেই সব তীর্থ দেখতে পাব। একটু চেষ্টা করলে ভারতে পৌঁছে সারানাথ—যেখানে বুদ্ধদেব ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করেন আর কুশীনগর যেখানে তিনি নির্বাণলাভ করেন সে তীর্থও দেখতে পাব। আর যেখানে আমরা যাচ্ছি সেই বিক্রমশীলার মঠও কম বড় তীর্থ নয়।"

"বিক্রমশীলার মঠটী কোথায় ?"

"বিক্রমশীলা সম্বন্ধে সব খবরই আমাদের সরদার জানেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে অনেক কথা জানতে পারবে। তিনি সেখানে অনেকদিন ছিলেন।"

তখন সবাই দলের সরদার ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করল—"আপনি না এর আগে বিক্রমশীলায় একবার গিয়েছিলেন ?"

তিনি বল্লেন—"হাঁ, অনেকদিন আগে আমি সেখানে গিয়েছিলাম।"

"তবে আমাদের সেখানকার সম্বন্ধে গল্প বলুন।"

তিনি বলতে লাগলেন—"আমি তখন গিয়েছিলুম ছাত্রভাবে। আমার সঙ্গে আরও কজন ছেলে তিব্বত থেকে গিয়েছিল। তখন আমরা নতুন ভিক্ষু হয়েছি, তাই আমাদের উৎসাহ ছিল যথেষ্ট। সেই উৎসাহের জোরে পথের এই অসংখ্য ভয়, বিপদ

আপদ অগ্রাহ্য করে, আমরা সেখানে যাই। ভিক্ষু হয়ে আমাদের লামার কাছে খানকতক বৌদ্ধ পুঁথি তিব্বতী ভাষায় পড়েছিলাম। তাতেই জানলাম যে ভগবান বুদ্ধদেবের জন্মস্থান হচ্ছে ভারতবর্ষ (যাকে আমরা তিব্বতীতে 'বিস্তৃত দেশ' বলে থাকি)। তাইতে আমরা ভাবলাম যে ভগবান বুদ্ধদেব যেখানে জন্মেছিলেন, যেখানে সদ্ধর্ম্ম প্রচার করেছিলেন, যেখানে নির্বাণলাভ করেন—সেই সব তীর্থস্থান আমাদের দেখা দরকার। তা ছাড়া সংস্কৃতভাষা শেখার ভাল সুবিধা তিব্বতে পেলাম না, যদিও তিব্বতী ভাষায় সংস্কৃত শেখার জন্যে ব্যাকরণও দুচারখানা ছিল, (৫) তাই সংস্কৃত শেখার জন্যও ভারতে আসতে হয়েছিল।"

একজন জিজ্ঞাসা করলে—"কেন, সংস্কৃত শেখার কি দরকার ছিল ?"

তিনি বল্লেন—"কারণ বেশীরভাগ বৌদ্ধ পুঁথি সংস্কৃতে লেখা, অবশ্য পালিভাষায় বৌদ্ধ পুঁথি ছিল, কিন্তু মহাযানদের বই সংস্কৃততেই লেখা হয়েছিল। আমি দেখলাম যে যদি সংস্কৃত না শিখি, তবে সব বৌদ্ধশাস্ত্র পড়তে পারব না বা তার মর্ম্মগ্রহণ করতে পারব না। তখনি অনেক সংস্কৃত বই তিব্বতীভাষায় অনুবাদ হয়েছিল বটে, তবু বিরাট সংস্কৃত বৌদ্ধশাস্ত্রের অনেক বাকি ছিল। তাই আমি সংস্কৃত পড়তে এলাম। আমি ও

---

(৫) তিব্বতীরা পানিণি ও আর আর অনেক ব্যাকরণ নিজেদের ভাষায় অনুবাদ করেছে।

আমার সঙ্গীরা আগেই ঠিক করেছিলাম যে আমরা পড়ব—বিক্রমশীলার মঠে। সেই কত বৎসর আগে ছাত্রভাবে গিয়েছিলাম এই মঠে—আজ আবার সেই মঠেই যাচ্ছি রাজার প্রতিনিধি হয়ে।"

"বিক্রমশীলার মঠটী কোথায় ?"

"মগধদেশে গঙ্গারই ঠিক তীরে একটা পাহাড়ের ওপর এই মঠটী তৈরী হয়েছে (৬)।"

"এ মঠটীর প্রতিষ্ঠা করেন কে ?"

"মহারাজাধিরাজ পরমভট্টারক পরমসৌগত শ্রীমান্ ধর্ম্মপাল।"

এই কথা শুনে একজন বলে উঠ্‌ল—"ওঃ বাবা, নামটী ত কম বড় নয়—এটী আবার আমাদের তিব্বতীভাষায় অনুবাদ করতে গেলে আরও লম্বা হয়ে পড়বে। হ্যাঁ, সর্দ্দার, কি নামটা বল্লেন—রাজাধিরাজ ভট্টারক মর্ম্মপাল ? না কি ?"

আর একজন বল্লে—"তুমি যে দেখছি একেবারে শ্রুতিধর। রাজাধিরাজ নয় মহারাজাধিরাজ পরমভট্টারক পরমসৌগত শ্রীমান্ ধর্ম্মপাল।"

"আরে যাই হোক্ না ? তবুও নামটী ত কম নয়।"

---

(৬) বর্ত্তমান ভাগলপুরে পাথরঘাটার কাছে এই বিক্রমশীলার মঠ ছিল বলে পণ্ডিতরা অনুমান করেন। অনেকে এটীকে ঢাকার, বিক্রমপুরের সঙ্গে যুক্ত করতে চান। কিন্তু লামা তারানাথ মগধে গঙ্গার তীরেই এর স্থান নির্দ্দেশ করেছেন। এ সম্বন্ধে শ্রীনন্দলাল দের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য J. A. S. B. 1905.

এবার সর্দ্দার বল্লেন—"না, নামটী হচ্ছে শুধু ধর্ম্মপাল, আর সব তাঁর উপাধি, তিনি বাংলা আর মগধের রাজা ছিলেন। তিনি নিজে বৌদ্ধ ছিলেন, তাই বৌদ্ধ ভিক্ষুদের থাকবার জন্য আর শাস্ত্রাদি চর্চ্চা করবার জন্যে মঠটী স্থাপন করেন। এই মঠটী তৈরী করতে অজস্র টাকা খরচ হয়েছিল। এখন দেখবে—কি সুন্দর এই মঠ। এর মধ্যে সবশুদ্ধ ১০৮টী মন্দির আছে, আর ঠিক মাঝখানে এক প্রকাণ্ড মন্দির আছে যার মধ্যে মহাবোধি মূর্ত্তি রাখা আছে। এ সব মন্দিরগুলোতে কি সুন্দর কারুকার্য্য তা চোখে না দেখলে বোঝা যায় না। তা ছাড়া ছাত্রদের থাকবারও বেশ সুন্দর ব্যবস্থা, ছাত্রদের পড়বার জন্যেও আলাদা বন্দোবস্ত করা আছে। নালন্দার মত এখানেও নানা দেশ বিদেশ থেকে ছাত্ররা আসত জ্ঞান আহরণ করতে। আমাদের সময়ও তিব্বতের অনেক ছেলে ছিল, আবার গান্ধার, উজ্জয়িনী, কাশীথেকেও অনেক ছাত্র আসত।"

"কিন্তু আমরাত ছাত্র নই আমাদের ঢুকতে দেবে ত ?"

"আমরা ছাত্র হিসাবে যাচ্ছি না বটে, আমরা ত যাত্রী হিসাবে দর্শক হিসাবে যাচ্ছি—সুতরাং আমাদের দেখতে দিতে আপত্তি করবে কেন ? আর আমরা রাজার লোক, আমরা যাচ্ছি মঠের অধ্যক্ষ মহাভিক্ষুর সঙ্গে দেখা করতে, আমাদের ত আরও আদরের সঙ্গে অভ্যর্থনা করবে।"

"আচ্ছা, আমরা কি যাবার সময় তীর্থগুলো দেখতে পাব না ?"

"তা বলা যায় না—সেটা আমাদের উদ্দেশ্যের সাফল্যের ওপর নির্ভর করছে।"

এই রকমে তারা বসে বসে গল্পগুজব করছে, এমন সময় তাদেরই দলের এক চর এসে চুপি চুপি সর্দ্দারকে বল্লে—"ডাকাতের দল খবর পেয়েছে যে আমরা এখানে তাঁবু ফেলেছি! তারা মতলব করেছে আজ রাত্রিতে এসে আমাদের আক্রমণ করবে।"

এই খবর পেয়ে সর্দ্দার ত খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তাঁর কাছে রাজার দেওয়া অনেক টাকাকড়ি রয়েছে, তারপর এই সব লোকজন এদের সবাইকে বাঁচাতে হবে, নিজেও বাঁচতে হবে। নিজের কথা না হয় যাক্, তিনি এ পথে অনেকবার গেছেন, জানেন প্রাণ হাতে নিয়ে চলতে হয়। কিন্তু দলকে না বাঁচাতে পারলে রাজার উদ্দেশ্য যে পণ্ড হয়ে যাবে।

তখন তিনি দু'একজনে নিয়ে পরামর্শ করতে লাগলেন—কি করা যায়। শেষে দু'একজন গিয়ে খোঁজ নিলে কাছে কোনও বড়গাছ আছে কিনা। সুখের বিষয় একটু দূরেই একটা প্রকাণ্ড গাছ পাওয়া গেল। তখন সেই গাছের নীচে আর একটা তাঁবু ফেলা হল, আর প্রথমটীতে লম্বা লম্বা কাঠ ফেলে তার ওপরে কাপড় আর কম্বল চাপিয়ে দেওয়া হল। শেষকালে আগুন নিবিয়ে দিয়ে সবাই সেই বড় গাছটীতে উঠে বসল।

দেখতে দেখতে রাত্রির অন্ধকার নেমে এসে অন্ধকারকে আরও জমাট করে দিলে। চারিদিক একেবারে নিঝুম, নিস্তব্ধ, কোথাও একটীও সাড়া শব্দ নেই। এমন সময় হঠাৎ সেই

ডাকাতের দল এসে খুজতে লাগল সেই যাত্রীদের। তারা এসেই আগেকার প্রথম তাঁবুটী খুঁজলে। দেখলে সব শান্ত, নিস্তব্ধ; ভাবলে যাত্রীরা বুঝি ঘুমুচ্ছে।

হঠাৎ তাদের আক্রমণ করবে ভেবে চুপি চুপি তাঁবুতে ঢুকে তারা অস্ত্র চালাতে লাগ্‌ল, কিন্তু সেই অস্ত্রগুলো কেবল কঠিন ব্যঙ্গধ্বনি করে ফিরে এল। ডাকাতরা ভাবলে—এ কি হল? তবে কি যাত্রীরা আগে থেকে খবর পেয়ে পালিয়েছে? এ তাঁবুতে ত তাদের চিহ্নমাত্র ও নেই। আচ্ছা, এই যে লম্বা লম্বা মানুষের মত শুয়ে রয়েছে, এ গুলো কি? যেই তারা সেই কম্বল আর কাপড় সরিয়ে দেখল, দেখে সেখানে মানুষের বদলে কতকগুলো শক্ত কাঠ—শুধু কাঠ। তবে মানুষ গুলো কি ভোজবাজীতে উড়ে গেল? তারা গেল কোথায়? খোঁজ, খোঁজ।

এ দিক ও দিক খুজতে খুজতে সেই দ্বিতীয় তাঁবুটা তাদের চোখে পড়ল। তারা ছুটেগিয়ে সেটার ভেতরে ঢুকল, কিন্তু কৈ—সেখানেও ত কেউ নেই, সব ফাঁকা। এ দিকে যাত্রীরা গাছের ওপর বসে বসে তীর ছুঁড়তে লাগল। আচমকা তীরগুলো এসে ডাকাতদের বিদ্ধ করতে লাগল, আর তাদের অসাড় দেহ পাথরের ওপর লুটিয়ে পড়তে লাগল। যারা বাকি রইল তারা প্রাণভয়ে পালিয়ে গেল।

এই রকমে সে দিন যাত্রীরা ডাকাতদের হাত থেকে বাঁচল। তাদের হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়ে তারা ভগবান্ বুদ্ধদেবকে উদ্দেশ্যে নমস্কার করে বলতে লাগল—"ওং মণিপদ্মে নমঃ হুং।"

[চার]

এবার বুঝি যাত্রীদের কষ্টের অবসান হল—তারা হিমালয় পার হতে পেরেছে।

যাত্রীরা একে একে সেই বিরাট পাহাড় থেকে নামচে, আর নেমে সেই পরমপুরুষকে ধন্যবাদ দিচ্ছে হাঁটু গেড়ে বসে। আজ কতদিন পরে, কত কষ্ট, কত দুঃখ, কত জ্বালা যন্ত্রণা সহ্য করে তারা সফলতাকে বরণ করতে পেরেছে। তাই আজ প্রাণ ভরে ধন্যবাদ দিয়ে নিলে তাঁকে, যাঁর কৃপায় তারা বিনাশের হাত থেকে বেঁচে এসেছে। মৃত্যু তাদের পথ আগলিয়ে বসেছিল, তারা কিন্তু তাকে বিভ্রান্ত করে চলে এসেছে, কেবল ২।৫ জন তার সঙ্গে যুঝতে না পেরে অমর লোকে চলে গেছে।

এবার মনের আনন্দে, নতুন উৎসাহে যাত্রীরা পথ চলতে লাগ্‌ল। এবার সেই দারুণ শীত নেই, বরফ নেই, কুয়াসা নেই, হাজার রকম বিপদেরও সম্ভাবনা নেই। যতই তারা এগিয়ে যেতে লাগ্‌ল, কেবল দুধারে খালি মাঠ দেখতে পেতে লাগল।

যাত্রীদের অদ্ভুত পোষাক, হাতে মালা, ঘণ্টা ও আর সব জিনিষ দেখে সবাই অবাক্ হয়ে তাদের দিকে তাকায় আর জিজ্ঞাসা করে—"কোন্ দেশের লোক তোমরা হে?"

তারা বলে—"ঐ যে দূরে একটা মস্ত বড় পাহাড় দেখছ, তারই ঐ ওপার থেকে আমরা আস্‌ছি।"

অনেক সময় যাত্রীরা ঠিক করতে পারে না কোন্ পথে যাবে,

পথের মাঝে থম্‌কে দাঁড়িয়ে যাকে সামনে পায় জিজ্ঞাসা করে—"বিক্রমশিলা কোথায় বলতে পার ?" কেউ হয় ত বলে—"অত শিলাটিলা বুঝি না বাপু, অন্য লোককে জিজ্ঞাসা কর।" আবার কেউ হয় ত বলে—"তোমাদের কিচিরমিচির ভাষাই বুঝি না তা জবাব দোব কি ?" কেউ দয়া করে বলে দেয়—"ঐ রাস্তা দিয়ে মেঠো পথ ধরে যাও, ঠিক পৌঁছতে পারবে।" এমনি করে জিজ্ঞাসা করতে করতে যাত্রীরা পথ এগিয়ে চলেছে।

সন্ধ্যার সময় তারা হাজির হল এক গ্রামে। তারা ভাবলে গ্রামে কোথায়ও আশ্রয় নেবে। একজন বৃদ্ধলোকের সঙ্গে দেখা হতে, দলের সরদার তাকে বল্লেন—"আজকের রাত্রের মত এ গ্রামে আমাদের আশ্রয় হতে পারে কি ?"

বৃদ্ধ একটু ভেবে বল্লেন—"আপনারা কে ? আপনাদের কথায় বোধ হচ্ছে আপনারা বিদেশী। কোথা থেকে আসচেন আপনারা ?"

"হাঁ, আমরা বিদেশী। আমরা আসছি হিমালয়ের ওপার ভোট দেশ থেকে।"

"ওঃ, এত দূর দেশে থেকে আসছেন আপনারা। কোথায় যাবেন ?"

"বিক্রমশিলার মঠে।"

"সেও ত এখান থেকে অনেক দূর। আপনারা কতজন আছেন ?"

"৪০।৫০ জন।"

"তবেই ত মুস্কিল! আমার বাড়ীতে ত এত জায়গা নেই যে আপনাদের সবাইকে স্থান দোব। আচ্ছা, আসুন আমার সঙ্গে অন্যত্র চেষ্টা দেখি।"

এই বলে তিনি যাত্রীদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চল্লেন।

সে সময় সেই গ্রামেতে ব্যবসাদারদের একটী সমিতি ছিল। সেই সমিতি তখন "শ্রেণী" (৭) বলে পরিচিত ছিল। এই সমিতির ক্ষমতা ছিল যথেষ্ট, ব্যবসার নানা প্রশ্নের মীমাংসা ত সমিতি করতই, তা ছাড়া সাধারণের টাকা জমা নেওয়া ও সাধারণের সুবিধার জন্য নানা রকম সৎকার্য্য করাও সমিতির কাজ ছিল। সমিতির কাজের জন্য সমিতির নিজের সাধারণ ঘর বাড়ী ছিল। বৃদ্ধ নিজে গ্রাম্য সমিতির সভ্য বলে, সমিতির কর্ত্তৃপক্ষের কাছে যাত্রীদের নিয়ে গেলেন, এবং রাত্রের মত তাদের বাসের ব্যবস্থা করে দিতে অনুরোধ করলেন।

তাই হল, সমিতির লোকেরা খুব উৎসাহের সঙ্গে বিদেশী যাত্রীদের অভ্যর্থনা করলেন আর সুন্দর ভাবে তাঁদের থাকবার ও খাবার ব্যবস্থা করে দিলেন। যাত্রীরা তাদের আতিথ্য গ্রহণ করে কৃতার্থ হল।

যাত্রীরা মঠে পোঁচেছে।

আজ তাদের সব কষ্ট সব দুঃখ সফল হল। আজ তাদের মনের কামনা পূর্ণ হল; যে লক্ষ্য নিয়ে তারা নিজের দেশ, ঘর

(৭) এ বিষয়ে Dr. R. C. Majumdar's Corporate Life in Ancient India P. 3. দ্রষ্টব্য।

বাড়ী ছেড়ে এসেছে, আজ সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ হবার সুযোগ এসেছে। যে বার্ত্তা বহন করে তারা সেই সুদূর তিব্বত থেকে মগধে এসেছে, এইবার সেই বার্ত্তা, সেই নিমন্ত্রণ দিতে হবে—মহা-উপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীজ্ঞানদীপঙ্করকে।

মঠটী পাহাড়ের ওপরে, পাশেই গঙ্গা কুলকুল শব্দ করে প্রবাহিত হচ্ছে। সিঁড়ি ভেঙে যাত্রীরা অনেক আশা করে ওপরে উঠ্‌ল। সামনেই ফটক, কিন্তু একি ফটক যে বন্ধ! তাদের সব আশা ভরসা বুঝি লোপ পেল।

তখন রাত হয়েছে।

মঠের ভেতর থেকে আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু ভেতরে যাবার যে উপায় নেই। যে উচু প্রাচীর দিয়ে মঠটী ঘেরা, কারও সাধ্য নেই যে সহজে সেই প্রাচীর পার হয়ে ভেতরে প্রবেশ করবে।

দলপতি ভিক্ষু বল্লেন—"আচ্ছা, ৬টা ফটক ত ছিল, চল দেখি আরগুলো বন্ধ আছে কি না?"

তখন তারা আর একটা সিংহদ্বারে গেল, হায় সেটাও যে বন্ধ। এমনি করে সব সিংহদ্বারে গিয়ে দেখলে যে কোনটাই খোলা নেই।

শেষ দরজায় যখন যাত্রীরা এসে দাঁড়াল, তখন শুনতে পেল মঠে ভিক্ষুরা ভগবান্ বুদ্ধদেবের উদ্দেশ্যে বলছেন—

"উপেমি বুদ্ধং সরণং
ধর্ম্মং সঙ্ঘঞ্চ তাদিনং।

সমাদিয়ামি সীলানি
তং সে অত্থায় হেতিতি॥" (৮)

যাত্রীরাও সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধদেবের উদ্দেশ্যে প্রণাম করল।

রাত্রি বেশী হচ্ছে দেখে, দলপতি ভিক্ষু—সিংহদ্বারে ধাক্কা দিয়ে ডাকলেন—

"ওহে দ্বারি, দোর খোল।"

ভেতর থেকে প্রশ্ন হল—"তোমরা কে?"

"আমরা বিদেশী। আশ্রয় চাইচি।"

"তোমাদের কথায় বোধ হচ্ছে তোমরা লামার দেশে থেকে আসৃছ। কিন্তু আজ ত ভেতরে প্রবেশ করতে পাবে না, কাছেই ধর্ম্মশালা আছে সেখানে আশ্রয় নেও গে।"

অগত্যা যাত্রীর দল ধর্ম্মশালা খুঁজে গিয়ে, সেখানেই আশ্রয় নিলে।

পরদিন সকালে উঠেই সরদারের প্রথমে যার সঙ্গে দেখা হল, সেই ভিক্ষুর সঙ্গে আগে থেকেই পরিচয় ছিল। তাঁর সঙ্গে তিনি একত্র বৌদ্ধদর্শন পড়েছিলেন এই বিক্রমশিলার মঠে। তাঁর নাম হচ্ছে—পণ্ডিত তথাগত রক্ষিত। তাঁকে দেখেই তিব্বতী লামা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন, তিনি বল্লেন—"ভন্তে, আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন।"

---

(৮) "বুদ্ধ-ধর্ম্ম-সঙ্ঘ আমি করিব শরণ;
শীল ধর্ম্মে করিব গো মঙ্গল বরণ।"
(থেরীগাথা—শ্রীবিজয় চন্দ্র মজুমদার পৃঃ ৮৯)

পণ্ডিত তথাগতরক্ষিত ফিরে দেখলেন তাঁরই পরিচিত এক তিব্বতী লামা তাঁকে সম্বোধন করছেন। তিনি আনন্দের সঙ্গে উত্তর দিলেন—"ও, অনেক দিন পরে আপনার সঙ্গে দেখা হল। আপনি ভাল আছেন ত ? আবার যে মঠে ফিরে এলেন ?"

তিব্বতী লামা বল্লেন—"এই, আমাদের স্বদেশবাসীদের দেখাতে এলাম আপনাদের বিখ্যাত মঠটী।"

"সেত খুবই ভাল। আপনার কিন্তু যেন আরও কিছু উদ্দেশ্য আছে বলে মনে হয়।"

লামা একটু চিন্তা করে বল্লেন—"না, হাঁ—তা আপনাকে বলতে কিছু বাধা নেই। আপনি হলেন পুরাণ সতীর্থ, আপনাকে নির্ভয়ে বলতে পারি। আমাদের মহারাজা আচার্য্য দীপঙ্করকে ভোট দেশে নিয়ে যাবার জন্য নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছেন। তাই আমরা এসেছি আচার্য্যদেবকে নিয়ে যাবার জন্যে।"

পণ্ডিত তথাগতরক্ষিত চম্‌কে উঠে বল্লেন—"আরে সেকি ? সেও কি সম্ভব হয় ! আপনারা যত সব পাগল জুটেছেন। বিক্রম-শিলার ভিক্ষু-সংঘ তাঁকে ছাড়বে কেন ? তারা যে তাঁকে প্রাণের চেয়ে ও ভালবাসে, আর তাঁর গৌরবেই বিক্রমশিলার গৌরব। তাঁকে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব, আর তিনি নিজে ও বিক্রমশিলার সংঘকে বড় ভালবাসেন, এর সঙ্গে তিনি অনেকদিন জড়িত আছেন, তিনি ও আপনাদের রাজার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করবেন না। যাক্, আমি আপনাকে নিরুৎসাহ করতে চাই না, আপনি একবার আচার্য্যদেবের সঙ্গে দেখা করে দেখুন কি হয়।"

একটু ভেবে তিনি আবার বলতে লাগলেন—"কিন্তু সাবধান কাকে ও যেন এ মঠে বলবেন না আপনারা আচার্য্যদেবকে নিয়ে যেতে এসেছেন, তা হলেই মুস্কিলে পড়বেন। তার চেয়ে এক কাজ করুন, আপনারা গিয়ে বলুনগে যে আমরা ছাত্রভাবে পড়তে এসেছি। তা'হলে যদি আপনাদের মনস্কামনা পূর্ণ হয়।"

তিব্বতী লামা বল্লেন—"সেই ভাল। চলুন এখন কোন্ সিংহদ্বার দিয়ে আমরা যাব। আর কোন্ কোন্ মহাস্থবির কোন্ সিংহদ্বারে আছেন, তাত আমি জানি না। চলুন আপনি বলে দেবেন।"

পণ্ডিত তথাগত রক্ষিত উত্তর দিলেন—"আস্থন আমি সব বলে দিচ্ছি। দক্ষিণ দিকের সিংহদ্বারের অধ্যক্ষ—এখন পণ্ডিত প্রজ্ঞাকরমতি, পূর্ব্বদ্বারের অধ্যক্ষ—মহাপণ্ডিত রত্নাকর শান্তি, পশ্চিমদিকার সিংহদ্বারের—বাগীশ্বরকীর্ত্তি, উত্তর দ্বারের—পণ্ডিত নরোপা। আর মধ্যে দুটী সিংহদ্বার আছে, একটী পণ্ডিত রত্নবজ্রের ও অপরটী পণ্ডিত জ্ঞান-শ্রীমিত্রের অধীনে। এঁরা সকলেই জ্ঞানী আর পণ্ডিত বলে পরিচিত, এঁরা বৌদ্ধ শাস্ত্রে খুব পারদর্শী। (৯)

যে সব ছাত্র বিক্রমশিলার মঠে পড়তে আসেন, তাঁদের পরীক্ষা করাই এঁদের কাজ। সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে না পারলে কেউই এ মঠে পড়বার অনুমতি পান না। (১০) তা

---

(৯) ৺সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের Indian Logic appendix দ্রষ্টব্য।

(১০) নালন্দায়ও এ নিয়ম ছিল, Beal-Records of the Western World p 171

আপনাদের মধ্যে যাঁরা বাস্তবিক বৌদ্ধশাস্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন আর শিক্ষিত, তাঁরাই যেন প্রবেশ করবার অনুমতি প্রার্থী হন, আর যারা সিপাই অথচ তেমন শিক্ষিত নয় তারা যেন ছাত্রভাবে প্রবেশ করবার অনুমতি না চান—তারা এমনি মঠটী পরিদর্শন করে আসতে পারেন। পরে তাঁরা গ্রামে কোথা ও আশ্রয় নেবেন যতদিন না আপনারা ফেরেন।”

তাই ঠিক হল, যাত্রীরা দুটো দলে ভাগ হল—একদল পিছনে রইল তারা কিছুপরে মঠে প্রবেশ করবে। অন্যদল তিব্বতী লামার সঙ্গে দক্ষিণের সিংহদ্বারে গিয়ে উপস্থিত হল। পণ্ডিত তথাগতরক্ষিত তাদের পরিচয় করিয়ে দিলে পণ্ডিত প্রজ্ঞাকর-মতির সঙ্গে। তিনি বল্লেন—“ভন্তে, এই বিদেশীরা ভোট দেশ থেকে এসেছে, এরা অনুমতি চাইছে প্রবেশ করবার জন্যে।”

প্রজ্ঞাকরমতি উত্তর দিলেন—“কিন্তু তার আগে পরীক্ষা করা দরকার। আপনারা এগিয়ে আসুন।”

দলপতি লামা এগিয়ে এসে বল্লেন—“ভন্তে, আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন।” তাঁর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে তিনি বল্লেন—“আপনার মুখ যে পরিচিত বলে বোধ হচ্ছে।”

“হাঁ, আমি কিছুকাল্ল আগে এখানে ছাত্র ছিলাম।”

“এখানে ছাত্র ছিলেন? তবে আপনার পরীক্ষার ত দরকার নেই। আপনার দলের অন্য লোক আসুক।”

আর একজন যাত্রী আগিয়ে এল, মহাভিক্ষু তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—“আপনার বাড়ী কোথায়?”

"ভোট দেশে।"

"ভোট দেশে কি করে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবেশ করল, বলতে পারেন ?"

"পারি। যখন স্রোং-সান্ গামপো ভোট দেশের রাজা ছিলেন, তখনই বৌদ্ধধর্ম্ম আমাদের দেশে প্রবেশ করে। তিনি দুই বৌদ্ধ রাজার মেয়ে বিবাহ করেন একজন চীনদেশের রাজকুমারী আর একজন নেপালের রাজকুমারী। নেপালের রাজকুমারীকে বিবাহ করবার সময় তিনি নিজে নেপালরাজের কাছে স্বীকার করেন—"আমার দেশ এখন ও সভ্যতার আলোক পায় নি, ভগবান্ বুদ্ধদেবের ধর্ম্মের বার্ত্তা ও পায় নি। আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে এই বিবাহের পর ভোটদেশ বৌদ্ধ মন্দির ও ভিক্ষুতে পূর্ণ করে দেব।" তাই হয়েছিল। বিবাহের পর তিনি ভারতে দূত পাঠান এ দেশ থেকে বৌদ্ধ পুঁথি ও ভিক্ষুদের নিয়ে যাবার জন্যে। অবশ্য এই সব কাজে রাজকুমারীদের প্রভাব যথেষ্ট ছিল, তাঁরা না থাকলে বোধ হয় ভোট দেশে এত শীঘ্র বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তার লাভ করতে পারত না। এর জন্যেই বোধ হয় আমরা রাজকুমারীদের তারাদেবী বলে পূজা করি।" (১১)

এ উত্তরে সন্তুষ্ট হয়ে মহাভিক্ষু, অপর একজন যাত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন "আচ্ছা, পণ্ডিত পদ্মসম্ভব সম্বন্ধে কিছু জান ?"

"জানি বৈ কি। তিনি একজন ভারতীয় পণ্ডিত, থাকতেন

(১১) Waddel's Lamaism দ্রষ্টব্য।

নালন্দার মঠে। তাঁর সম্বন্ধে নানান গল্প তিব্বতে প্রচলিত আছে। তাঁর বাড়ী ছিল কাশ্মীরে। তাঁর জন্ম পদ্মের মধ্যে হয়েছিল বলে তাঁকে পদ্মসম্ভব বলা হয়। সে সময় তিব্বতের সিংহাসনে যিনি বসে ছিলেন তাঁর নাম—থি-স্রোং-দেতসন্। তাঁর গুরু ছিলেন—শান্তরক্ষিত, একজন ভারতীয় পণ্ডিত। রাজগুরু শান্তরক্ষিতের পরামর্শে রাজা পণ্ডিত পদ্মসম্ভবকে ডেকে পাঠান নালন্দা থেকে। তিনি যখন তিব্বতের রাজসভায় হাজির হলেন, তাঁকে খুব সম্মানের সঙ্গে অভ্যর্থনা করা হল। তিনি তিব্বতের বৌদ্ধধর্ম্মে যে সব জঞ্জাল ছিল, তা একেবারে পরিষ্কার করে দিলেন। তিব্বতের লোকেরা এবং রাজা নিজে তাঁকে যথেষ্ট খাতির করতেন। আমরা এখন ও তাঁকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা প্রদর্শন করি।” (১২)

এই রকম করে সব যাত্রীদের যখন পরীক্ষা হয়ে গেল,মহাভিক্ষু তাদের ওপর সন্তুষ্ট হয়ে তাদের মঠে প্রবেশ করবার অনুমতি দিলেন।

যাত্রীরা মহা আনন্দে মঠের মধ্যে প্রবেশ করল। তাদের সঙ্গে পণ্ডিত তথাগতরক্ষিত ছিলেন, তাঁকে লামা বল্লেন—“ভন্তে, আপনিই আমাদের পথ প্রদর্শক হোন, আমি ঠিক সব পথ চিনতে পারব না অনেক দিন হয়ে গেছে। আপনি এদের সব দেখিয়ে দিন।”

---

(১২) Waddels Lamaism দ্রষ্টব্য।

তথাগতরক্ষিত উত্তর দিলেন—"আসুন, তা'হলে আমরা এই পথ ধরে আগে একেবারে মহাবোধি মন্দিরে যাই। এখানে মন্দির আছে অনেক—মোট ১০৮টী। এই মহাবোধি মন্দিরটী আমাদের মঠের ঠিক মাঝখানে অবস্থিত। এ ছাড়া ৫৩টী ছোট মন্দির আর ৫০টী সাধারণ মন্দির আছে। এ সবগুলিই প্রতিষ্ঠা করেছেন বাংলা মগধের রাজা পরমভট্টারক ধর্ম্মপাল।" (১৩)

সেই মন্দিরে মহাবোধি মূর্ত্তি দেখে, যাত্রীরা অন্যদিকে অগ্রসর হল। পথে তথাগতরক্ষিত বল্লেন—"ঐ যে ওপাশে যে ঘরগুলো দেখছেন, সেখানে আমাদের আচার্য্যরা থাকেন। মহারাজ ধর্ম্মপাল যখন এই বিশাল মঠটী স্থাপন করেন, তখন তিনি এখানে ১০৮ জন পণ্ডিতের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। (১৪)

এখন এই পণ্ডিতের সংখ্যা অনেক বেড়েছে। তাঁরা সব বৌদ্ধ ভিক্ষু—অনেকেই আগে এ মঠের ছাত্র ছিলেন, এখন নানান্ বিষয়ে অধ্যাপক হয়েছেন। এঁদের মধ্যে অনেক দেশবিখ্যাত পণ্ডিত, তাঁদের লেখা বই বৌদ্ধ জগতে সুপরিচিত। এখানে অনেকে নানান্ বই লিখেছেন—বৌদ্ধ দর্শন সম্বন্ধে।"

একজন যাত্রী জিজ্ঞাসা করল—"এখানে তিব্বতী শেখার বন্দোবস্ত নেই ?"

---

(১৩) Taranatha. P. 217.

(১৪) Taranath p. 217

"নিশ্চয়ই আছে। যাতে তিব্বতী ছাত্রদের সুবিধা হয় সেজন্যে তিব্বতী ভাষা পড়াবার বন্দোবস্ত আছে। আর এটী বোধ হয় অনেকে জানেন না যে তিব্বতী ভাষায় যে সব বই অনুবাদ হয়েছে, তার বেশীর ভাগ এখানকার পণ্ডিতরাই করেছেন।

আর এক যাত্রী জিজ্ঞাসা করলে—"আচ্ছা, কি কি বিষয়ের চর্চা হয় এখানে ?"

"এখানে প্রধানতঃ বৌদ্ধদর্শনেরই আলোচনা হয়। এখানে আচার্য্যরা যে সব বই লেখেন তা প্রায়ই বৌদ্ধদর্শন সম্বন্ধে। তা বলে যে অন্য অন্য বিষয় উপেক্ষিত হয় আমাদের হাতে তা নয়। সংস্কৃত, তিব্বতী ভাষার আলোচনাত হয়ই, চিকিৎসা জ্যোতিষী ব্যাকরণ তন্ত্র এসব বিষয়েরও আলোচনা হয়। এখানে ৬টী মহাবিদ্যালয় আছে, এসব বিষয় সেই মহাবিদ্যালয়ের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া আছে। ১০৮ জন অধ্যাপক নানান্ বিষয়ে এখানে অধ্যাপনা করেন।"

"বিদেশী ছাত্র এখানে আসে ?"

"আসে বৈ কি। বাংলা মগধ ছাড়া, ভারতের নানা দেশ এখানে তাদের ছেলেদের পাঠায় শিক্ষা লাভ করবার জন্যে। তা ছাড়া গান্ধার, কাশ্মীর, তুর্কীস্থান, তিব্বত এসব জায়গা থেকেও ছাত্ররা আসে। ছাত্রদের থাকবার স্থান এই দিকে। চলুন, আপনাদেরও থাকবার ব্যবস্থা সেখানে হবে, দেখবেন কত দেশের কত রকম ছেলে এখানে উপস্থিত হয়েছে।"

এই বলে তিনি যাত্রীদের ছাত্রাবাসে নিয়ে গেলেন। সেখানে ঘরগুলি কতক একজন থাকবার মত, কতক দুজন থাকবার মত। তারই মধ্যে কতকগুলি খালি ঘরে তিব্বতী যাত্রীদের থাকবার ব্যবস্থা করা হল। সেখানে তাদের আহারের বন্দোবস্তও হল।

[পাঁচ]

আজ অনেক কষ্টে তিব্বতী লামা আচার্য্য দীপঙ্করের সাক্ষাৎ পেয়েছেন।

এর আগে দু একদিন ভিক্ষুসংঘে আচার্য্যকে দেখেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর সঙ্গে আলাপ করবার সুবিধা পান নি। আজ আচার্য্যের ঘরে তাঁর ডাক পড়েছে, তাই তিব্বতী লামা যে বার্ত্তা নিয়ে সুদূর ভোট দেশ থেকে এসেছেন, সেই বার্ত্তা, সেই নিমন্ত্রণ আচার্য্যকে দিতে এসেছেন।

আচার্য্যকে প্রণাম করে লামা বল্লেন—"ভোট দেশের রাজা ও জন সাধারণের পক্ষ থেকে আমি আপনাকে অভিবাদন জানাচ্ছি।"

আচার্য্য তাঁর অভিবাদন স্বীকার করে বল্লেন—"ভোট দেশে সদ্ধর্ম্মের অবস্থা কেমন ?"

তিনি বল্লেন—"যখন প্রথম ভোট দেশে ভগবান বুদ্ধের ধর্ম্ম প্রবেশ করে, তখন নতুন ভিক্ষুদের মধ্যে একটা উৎসাহ ছিল, একটা কার্য্য তৎপরতা ছিল। তাঁরা বৌদ্ধধর্ম্মে দৃঢ় আস্থা স্থাপন করে, ভোটদেশের প্রান্তে প্রান্তে সদ্ধর্ম্ম প্রচার করেছিলেন। কিন্তু এখন ভিক্ষুসংঘে কেমন একটা জড়তা এসেছে, তাদের যেন সে উৎসাহ নেই, সদ্ধর্ম্মে সে আস্থা নেই। মাঝে মাঝে ভারতীয় পণ্ডিতরা গিয়ে তাদের জড়তা ভেঙে দিতেন, আর নতুন উৎসাহে উৎসাহিত করেন। এখন সদ্ধর্ম্ম এমন অবস্থায় এসে পড়েছে—যে ভারত থেকে কোন অনুপ্রেরণা না

এলে ভোটদেশের ভিক্ষুসংঘ জাগবে না। তাই আমাদের মহারাজা আপনাকে নিমন্ত্রণ করে পাঠিয়েছেন। আপনি না পদার্পণ করলে, তিব্বতের সদ্ধর্ম্ম একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে। তাই তিব্বত আপনাকে ডাকছে, সদ্ধর্ম্ম উদ্ধার করবার জন্য।"

এই বলে তিনি আচার্য্য দীপঙ্করের পায়ের কাছে অজস্র স্বর্ণমুদ্রা ঢেলে দিলেন।

চমকে উঠে আচার্য্য বল্লেন—"সর্ব্বনাশ। আমি ভিক্ষু, স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে আমি কি করব। নিয়ে যাও, ফিরিয়ে নিয়ে যাও তোমাদের রাজার কাছে।"

"এসব আমাদের মহারাজা আপনার সংঘকে উপহার দিয়েছেন, আর আপনাকে নিমন্ত্রণ করেছেন ভোটদেশে যাবার জন্য।"

আচার্য্যদেব বলে উঠলেন—"অসম্ভব, বিক্রমশিলার মঠ ছেড়ে যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। সমস্ত বিক্রমশিলার ভার আমার ওপর, দেশী বিদেশী যে সব ছাত্ররা এ মঠে আসে তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা, থাকার ব্যবস্থা করা, কোন্ ভিক্ষু কোন্ বিষয়ে অধ্যাপনা করেন—সে সব ঠিক করার ভার আমার ওপর। যে সব মন্দির রয়েছে মঠের ভিতরে সেই ১০৮টী মন্দির পর্য্যবেক্ষণের ভারও আমার ওপর। এই বিক্রমশিলার মঠ সম্পর্কীয় সমস্ত ব্যাপার আমার ওপর নির্ভর করছে। এই সব গুরু কর্ত্তব্যভার ছেড়ে আমি কি করে যাব ভোটদেশে! না, না—এ একেবারে অসম্ভব তোমাদের রাজার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা। তোমাদের রাজাকে বল গিয়ে আমাকে ক্ষমা করতে।"

"কিন্তু আমরা যে কত আশা করে কত দূর দেশ থেকে আস্‌ছি—শুধু আপনাকে ভোটদেশে নিয়ে যাবার জন্য। আপনি না গেলে ভোটদেশের ভিক্ষুসংঘ আর সদ্ধর্ম্ম একেবারে লোপ পেয়ে যাবে।"

"ভোটদেশে সদ্ধর্ম্মের এই দুরবস্থা শুনে বড়ই ব্যথিত হলুম, কিন্তু আমি যে আমার কর্ত্তব্য ছেড়ে যেতে পারি না। আরও আমার ইষ্ট দেবতার নিষেধ আছে—তাঁর অনুমতি ছাড়া আমি বিক্রমশিলা ত্যাগ করতে পারি না।"

"আমরা কিন্তু আপনাকে না পেলে বিক্রমশিলা ছেড়ে যাব না। যতদিন না আপনার মত বদলাবে ততদিন কেবল বসে ভগবান্ তথাগতের পূজা করব। আর যদি তিব্বতে বাস্তবিকই প্রাণের সঙ্গে ভগবান্ বুদ্ধদেবকে ডেকে থাকে, তবে আপনাকে নিশ্চয়ই যেতে হবে।"

তখন আচার্য্য বল্লেন—"আচ্ছা, যদি আমার ইষ্টদেবতার অনুমতি পাই, তবেই তোমাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারি।"

তারপর থেকে মঠের তিব্বতী ছাত্ররা পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে কেবল ভগবান্ বুদ্ধদেবের অর্চ্চনায় মগ্ন হল। তাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আচার্য্য দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানকে নিয়ে যাবেই। সময় নেই তারা কেবল—"ওঁ মনে পদ্মে হুং" বলে ঘণ্টা বাজিয়ে ধর্ম্মচক্র ঘুরিয়ে ভগবান্ তথাগতের পূজা করতে লাগল।

এই দেখে আচার্য্য দীপঙ্করের আসন বুঝি টল্‌ল।

তিনি একদিন রাত্রে তাঁর পূজার মন্দিরে প্রবেশ করলেন,

অনেকক্ষণ বসে ধ্যান করতে লাগলেন। তিনি কেবলই ভাবছিলেন—বিক্রমশিলা ছেড়ে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে কি না!

সেই কথা ভাবতে ভাবতে, তাঁর যেন মনে হল—তাঁর ইষ্টদেবতা তাঁর সামনে আবির্ভূত হয়েছেন।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—"এ ক্ষেত্রে আমার কর্ত্তব্য কি নির্দ্দেশ করে দিন।"

উত্তর এল—"তোমার ভবিষ্যৎ জীবনটা আমি বেশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। তোমার অদৃষ্টের লিখন যে শেষ জীবন তুমি স্বদেশে কাটাতে পারবে না, তোমায় বিদেশে ঘূরে বেড়াতে হবে। এই যে নিমন্ত্রণ তোমার কাছে এসেছে ভোটদেশের রাজার কাছ থেকে, এ তোমার নতুন ভবিষ্য জীবনের আদি সূচনা দিচ্ছে। ভোটদেশে তোমার নতুন কর্ত্তব্য রয়েছে, সেখানে সদ্ধর্ম্ম তোমাকে গড়ে তুলতে হবে, ভিক্ষু সংঘকে নতুন জীবন দিতে হবে। অবশ্য তোমার প্রিয় কার্য্যক্ষেত্র বিক্রমশিলা ছেড়ে যেতে তোমার কষ্ট হবে। কিন্তু তোমার ভোটদেশে যাত্রার মধ্যে আর একটী বিধির বিধান আছে। এই যে বিক্রমশিলার মঠ—যাকে ভিক্ষুসংঘ এত ভালবাস, তার আয়ু বেশীদিন নেই। এক শ বৎসরের মধ্যে যে এক বিনাশ হবে, তা আমি দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি। আমি বুঝতে পারছি এর বিনাশ হবে তুরস্কদের হাতে। তারা পশ্চিম দিক থেকে পঙ্গপালের মত ছুটে আসবে বাংলা মগধের ওপর, তারা হাতে কৃপাণ নিয়ে সব বিহার, মঠ

ভাঙবে। তোমাদের সাধের বিক্রমশিলার মঠ ও ভাঙবে—ভিক্ষুসংঘ কোন রকমে একে রক্ষা করতে পারবে না, তাদের মন্দির, পুঁথি-সব নষ্ট হয়ে যাবে। সেই সময় তাদের একমাত্র আশ্রয়স্থান হবে—ভোটদেশ। তাই তুমি যাও, তিব্বতে গিয়ে এমন সংঘারাম প্রতিষ্ঠা কর যেখানে পরে বিক্রমশিলা সংঘের ভিক্ষুরা আশ্রয় নিতে পারবে।" (১৫)

এই আদেশ বাণী পেয়ে আচার্য্য দীপঙ্কর কর্ত্তব্যের নতুন পথ দেখতে পেলেন। তিনি তিব্বত রাজের নিমন্ত্রণ স্বীকার করতে মনস্থ করলেন। পরদিন তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের সেই আদেশ বাণীর কথা বললেন। সকলেই তাঁর মতে মত দিলেন। তখন তিনি তিব্বতী লামাকে ডেকে বল্লেন—"আমি তোমাদের রাজার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম, গুরুর আদেশ পেয়েছি।"

এই কথা শুনে তিব্বতী লামা আনন্দে বলে উঠলেন—"ওং মণিপদ্মে নমঃ হুং।"

(১৫) মহম্মদ বকতিয়ার খিলজি বিক্রমশিলার মঠ আক্রমণ করে একেবারে নষ্ট করে দেন। এ সম্বন্ধে মুসলমান ঐতিহাসিকদের সাক্ষ্য প্রমাণ্য। তাঁরা বলেন যে বকতিয়ার খিলজি এ মঠের সমস্ত ভিক্ষুসংঘকে আক্রমণ করলে অনেকেই যুদ্ধে মারা যায়, যারা জীবিত ছিল তারা সম্ভবতঃ তিব্বতে পলায়ন করে। পরদিন মুসলমানরা এমন একটী লোক দেখতে পেল না যাকে সেই জায়গাটীর নাম জিজ্ঞাসা করে। অনেক কষ্টে একটা লোকের সন্ধান পেল, যে বল্লে—এটীর নাম বিহার। বিহার অর্থে ভিক্ষুদের মঠ। সেই বিহারে মুসলমানরা অনেক পুঁথি ও দেখতে পায়। সেই সময় মঠের অধ্যক্ষ ছিলেন—পণ্ডিত শাক্য-শ্রী। তিনি শেষকালে তিব্বতে পলায়ন করেন। V.A. Smith's Early History of India, ও J.A.S.B- Feb. 1911, Address P. X.I iii.

আজ বিক্রমশিলা মঠে বিরাট সভা।

সেই সভায় ভিক্ষুসংঘ আচার্য্য দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানকে বিদায় দেবেন।

সভা খুব সুন্দর ভাবে সাজান হয়েছে।

প্রায় দশ হাজার ভিক্ষু একত্র হয়েছে, এই বিদায় সভায় যোগ দেবার জন্যে। সবাই কিন্তু একটু ম্রিয়মান যে তাদের প্রিয় আচার্য্যদেবকে ছাড়তে হবে। তিব্বতী যাত্রীরা ও এই সভায় যোগ দিয়েছে, তাদের আনন্দের সীমা নেই, তাদের সব কষ্ট সফল হতে চলেছে। সবাই উৎকণ্ঠিত হয়ে অপেক্ষা করে আছেন, কখন আচার্য্যদেব আসবেন।

হঠাৎ সভাশুদ্ধ লোক দাঁড়িয়ে উঠল,—কাকে যেন অভ্যর্থনা করবার জন্য। দেখা গেল—আচার্য্য দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান আসছেন, আর তাঁর পিছনে জ্ঞানবৃদ্ধ মহাভিক্ষুরা আসছেন।

সবাই আসন গ্রহণ করলে, এক মহাভিক্ষু উঠে প্রথমে "জয়মঙ্গল" আবৃত্তি করলেন। পরে বলতে লাগলেন—"আজ আমরা একটা খুব কঠিন কাজের ভার নিয়ে এখানে সমবেত হয়েছি। আজ আমাদের প্রিয় আচার্য্যদেব আমাদের ত্যাগ করে তাঁর সাধের প্রতিষ্ঠান—বিক্রমশিলা ত্যাগ করে, তিনি ভোটদেশে যাবেন। তিনি যে আমাদের ত্যাগ করে যাচ্ছেন, এতে আমরা সবাই আন্তরিক ব্যথিত হয়েছি। আজ বিক্রমশিলা যে যশোগৌরবে

মণ্ডিত হয়েছে, তার জন্য আমরা ঋণী আমাদের আচার্য্যদেবের কাছে। তিনি থাকলে আমাদের এ প্রতিষ্ঠান আর ও দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি লাভ করত। তাই বলে আমরা তাঁর কর্ত্তব্যে বাধা দিতে পারি না। তিনি ভোটদেশে যাচ্ছেন কর্ত্তব্যের আহ্বানে, সেখানে সদ্ধর্ম্মকে পূর্ণজীবিত করতে। আমরা কেবল আচার্য্য-দেবকে বলতে পারি শুভস্তেপন্থানঃ।”

তিব্বতী যাত্রীরা পাশের এক ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করলেন—“ইনি কে?”

“জাননা, ইনি ভিক্ষু-সংঘের মধ্যে সব চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষু।”

তারপর আচার্য্য দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান আসন থেকে উঠে বলতে লাগলেন—

“হে ভিক্ষুসংঘ, আপনারা আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন। যে দিন থেকে আমি ভিক্ষু ধর্ম্ম-গ্রহণ করেছি, তখন থেকে আমার মনে এই সাধ ছিল যে আমি ভিক্ষুসংঘের সেবা করব। যখন আমি বিক্রমশিলার ভিক্ষুসংঘের সংস্পর্শে এলাম, তখন মনে হল যেন আমার জীবন ধন্য হল, আমার জীবনের সাধ—পূর্ণ হল। ক্রমে আপনারা আমার ওপর স্নেহ প্রদর্শন করে, আমাকে আদর করে, এই বিখ্যাত বিক্রমশিলা ভিক্ষুসংঘের কঠোর দায়িত্ব আমার স্কন্ধে অর্পণ করলেন—যদিও এ কাজের জন্য আপনাদের মধ্যে আমার চেয়ে জ্ঞানে, বিদ্যায়, বয়সে শ্রেষ্ঠ অনেক ছিলেন। ভগবান্ তথাগতের নাম স্মরণ করে সেই গুরু দায়িত্ব আমি গ্রহণ করে-ছিলাম, আর তাঁরই অপার করুণায় এতদিন সেই কার্য্য বিনা

বাধায় নিষ্পন্ন করেছিলাম। আশা করেছিলাম ভগবান্ বুদ্ধের নাম স্মরণ করে শেষ জীবনটাও এই মঠে কাটিয়ে দেব। কিন্তু দেখ্‌ছি বুদ্ধদেবের অভিরুচি তা নয়, আমাকে দিয়ে বিদেশে সদ্ধর্ম্মের কাজ করাবেন। ডাক এসেছে, তাই আমাকে যেতে হবে আমার সাধের বিক্রমশিলা ছেড়ে। আমায় যে যেতে হচ্ছে তাতে আমি বড় কাতর হচ্ছি। আমি যাচ্ছি একটা বেদনার স্মৃতি নিয়ে, অবশ্য এর সঙ্গে আর একটী গৌরবময় স্মৃতি থাকবে আমাদের মঠের। আমি আশা করি আমার অনুপস্থিতিতে এই বিক্রমশিলার মঠ ক্রমশঃ আরও বড় হবে, এর কার্য্যক্ষেত্র আরও বিস্তৃত হবে, আর এর গৌরব দিন দিন বাড়বে। আমার মনে হচ্ছে, ভোটদেশে বসে আমি মানসচক্ষে এই সব ছবি দেখতে পাব, আরও দেখতে পাব যে ভোটদেশে ও নানান্ জায়গা থেকে দলে দলে ছেলে আসছে আমাদের মঠে পড়বার জন্যে। অবশ্য এই রকম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এর বিনাশ একদিন আসবে—কিন্তু সে বিনাশ ভবিষ্যতের অন্ধকার গর্ভে লুকান রয়েছে। সেজন্যে আমরা চুপ করে নিশ্চিন্তভাবে বসে থাকতে পারব না—আমাদের কাজ করতে হবে, আমাদের সামনের দিকে অগ্রসর হতে হবে, বলতে হবে—

"আগে চল, আগে চল ভাই
পড়ে থাকা পিছে
মরে থাকা মিছে
বেঁচে মরে' কিবা ফল ভাই।
আগে চল, আগে চল ভাই"

শেষকালে আমার ছাত্রদের দু'একটা কথা বলতে চাই। তোমাদের মধ্যে কয়েকজনের পাঠ শেষ হল। কেউ ইচ্ছা করলে আমার সঙ্গে ভোটদেশে আসতে পার। তোমরা শীঘ্রই মঠ ছেড়ে সংসারে প্রবেশ করবে। সংসারের যে কাজেই থাক, ভিক্ষু হও রাজকার্য্য কর বা ব্যবসা কর, সব সময়েই তোমরা চেষ্টা করবে যাতে বিক্রমশিলার গৌরব নষ্ট না হয়। তোমাদের কার্য্যে, তোমাদের আচারে ব্যবহারে যেন নম্রতা, ভদ্রতা এমনভাবে জড়িত থাকে, যাকে তোমাদের দেখে বিক্রমশিলার ছাত্র বলে লোকে মনে করতে পারে। বিক্রমশিলার গৌরব তোমাদের হাতে, আশা করি তোমরা সেটী রক্ষা করবে। যখন কোন কাজ করতে যাবে তখন ধম্মপদের এই উপদেশটী মনে রেখো—

"ন তং কম্মং কতং সাধু, যং কত্বা অনুতপ্পতি।
যস্‌স অস্‌সুমুখো রোদং বিপাকং পটিসেবতি॥"

যে কাজ করে অনুতাপ করতে হয় এবং যে কর্ম্মের ফল অশ্রুসিক্ত মুখে ভোগ করতে হয়, সে রকম কাজ করা উচিত নয়। আর একটা সাধারণ উপদেশ স্মরণ রেখো—

"নহি বেরেন বেরানি সম্মন্তিধ কুদাচন।
অবেরেন চ সম্মন্তি এস ধম্মো সনাতন॥"

শত্রুতা দ্বারা কথনও শত্রুতা নিবারণ করা যায় না। মৈত্রী দিয়েই শত্রুতা রোধ করা যায়, এইই সনাতন ধর্ম্ম। আর আমি

বেশী কিছু বলতে চাই না, কেবল করযোড়ে আমি আর্য্য ভিক্ষু সঙ্ঘের কাছ থেকে বিদায় চাইছি।"

এই বলে আচার্য্য দীপঙ্কর আসন গ্রহণ করলে, সভার সকলে বলে উঠল—

"জয় আচার্য্যদেবের জয়।"

[সাত]

তিব্বতে আজ উৎসবের সাড়া পড়ে গেছে।

আজ তিব্বতের ভিক্ষুসংঘ আচার্য্য দীপঙ্করকে অভ্যর্থনা করতে এসেছেন। তিব্বতের রাজা নিজে সব বন্দোবস্ত করে দিচ্ছেন। তিনি নিজে আচার্য্যদেবকে অভিনন্দিত করবেন, আজ তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ হবে।

যখনই খবর এসেছে যে আচার্য্যদেব ভোটদেশের সীমান্তে পৌঁচেছেন, অমনি রাজা একদল সেনা নিয়ে তাঁর সেনাপতিকে পাঠিয়ে দিলেন তাঁকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসবার জন্যে।

এদিকে রাজসভায় তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে বিপুল আয়োজন হয়েছে। ভিক্ষুরা একদিকে দল বেঁধে বসেছেন আর তাঁদের হাতে ঘণ্টা, প্রার্থনাচক্র রয়েছে। অন্যদিকে রাজ্যের নানা লোকেরা জড় হয়েছে আচার্য্যদেবকে দেখবার জন্যে!

শেষকালে খবর এল—আচার্য্যদেব আসছেন! আগে আগে ঘোড়ায় চড়ে সেনারা এল, তারপর তিব্বতী যাত্রীরা, তাদের মাঝখানে ঘোড়ায় চড়ে আচার্য্যদেব এলেন, তাঁর পাশে অনেক ভারতীয় ভিক্ষু। আচার্য্যদেব পথে মালা জপতে জপতে আসছিলেন, আর বলছিলেন—"অতি ভাল অতি ভাল হে।"

তাঁকে দেখবার জন্যে রাস্তায় লোকে লোকারণ্য। তিব্বতের ছেলে বুড়ো সকলে এসেছে তাঁকে দেখবার জন্যে। কেউ বা তাঁর সামনে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করছে কেউবা রাস্তার ধূলো নিয়ে

মাথায় দিচ্ছে দেহ মন পবিত্র হবে বলে। সকলের মনে একটা আনন্দ—সবাই ভাবুছে যে আজ তিব্বতে এক মহাপুরুষ এসেছেন; যাঁর কৃপায় তিব্বতের সব লোক উদ্ধার হয়ে যাবে। সবাই দুহাত তুলে তাঁর জয়ধ্বনি করতে লাগল।

তারপর রাজপুরুষেরা তাঁকে রাজসভায় নিয়ে এলেন।

রাজসভায় তিনি প্রবেশ করতেই সবাই জয়ধ্বনি করে উঠল। রাজা নিজে আচার্য্যদেবকে নিয়ে এসে সিংহাসনের পাশে বসালেন, আর তার পাশে ভারতীয় ভিক্ষুরা বসলেন। প্রথমে রাজা উঠে বললেন—"হে আচার্য্যদেব, আপনার আগমনে আমাদের ভোট দেশ পবিত্র হল। আপনি বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাণ স্বরূপ, আপনাকে আনবার জন্যেই আমার পিতৃব্য প্রাণ হারান। আমার সৌভাগ্য যে আপনি আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে এই সুদূর ভোটরাজ্যে এসেছেন। আমি ও ভোটরাজ্যের সমস্ত বৌদ্ধ সেজন্যে আপনার কাছে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আপনি এখন এ রাজ্যের ধর্ম্ম কার্য্যের ভার গ্রহণ করুন। আপনি আমাদের ধর্ম্মগুরু হয়ে সদ্ধর্ম্মে আমাদের প্রবুদ্ধ করুন। এদেশে সদ্ধর্ম্মের অবস্থা অতি শোচনীয়, আপনার সাহায্য, আপনার অনুপ্রেরণা না পেলে এদেশে নতুন উৎসাহ জাগবে না। আমাদের ভিক্ষুসংঘ এখানেই উপস্থিত আছেন, এঁদের সাহায্যে আপনি কার্য্য আরম্ভ করুন। সর্ব্বশেষে আমি আপনার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করছি যাতে এই সৎকার্য্যে আমি আমার সাধ্য অনুসারে আপনার সাহায্য করতে পারি।"

এই বলে ভূমিষ্ট হয়ে রাজা আচার্য্যদেবের পদধূলি নিলেন।

এর পরে একজন প্রবীণ তিব্বতী ভিক্ষু উঠে একখানি অভি-নন্দন পাঠ করেন :—

"হে আচার্য্য, আপনি ভগবান্ বুদ্ধদেবের জন্মভূমি থেকে আসছেন, আপনি জ্ঞানে বিদ্যায় বোধিস্বত্ত্ব, আপনাকে নমস্কার। আপনি আমাদের ভিক্ষু সংঘকে নতুনভাবে, নতুন আদর্শে সঞ্জীবীত করুন।

"হে আচার্য্য, আপনি গৌড়ের রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেছেন, (১৬) কিন্তু রাজ্যের ধন ঐশ্বর্য্য আপনার মনকে মুগ্ধ করতে পারে নি, সে সব ত্যাগ করে ভগবান্ বুদ্ধের মত আপনিও সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন, সেজন্য আমাদের নমস্কার গ্রহণ করুন।

"হে আচার্য্য, আপনি বৌদ্ধজগতের গৌরবস্থল। আপনার শিক্ষার আরম্ভ ওদন্তপুরের বিহারে, আর সমাপ্তি সুবর্ণ দ্বীপের মহাপণ্ডিত চক্রকীর্ত্তির কাছে। জ্ঞানে বিদ্যায় আপনার সমকক্ষ বৌদ্ধজগতে নাই।

"হে আচার্য্য, আপনার জ্ঞানের পুবস্কারস্বরূপ মহারাজাধিরাজ নরপাল আপনাকে বিক্রমশিলা বিহারের সর্ব্বাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করেন। আর আপনি বৌদ্ধশাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলে আমাদের মহারাজা আপনাকে আমন্ত্রণ করে এনেছেন।

"হে আচার্য্য, আপনি যে আপনার প্রিয় বিক্রমশিলার মঠ ছেড়ে এদেশে এসেছেন সদ্ধর্ম্মের উদ্ধারের জন্য, সেজন্য আমাদের

(১৬) তাঁর পিতার নাম—কল্যাণ শ্রী ; আর মাতার নাম—প্রভাবতী

অভিবাদন গ্রহণ করুন। আমাদের এই ভিক্ষুসংঘ আপনারই আদেশ পালন করবার জন্য ব্যাকুল। আপনি আমাদের পথ দেখিয়ে দিন কোন্ পথে আমরা অগ্রসর হব।"

এই বলে ভিক্ষু আসন গ্রহণ করলে আচার্য্যদেব উত্তর দিলেন "হে তিব্বতবাসী, তোমরা আমার জন্যে যে বিপুল অভ্যর্থনার আয়োজন করেছ, জানি না আমি তার উপযুক্ত কি না, সেজন্যে আমি তোমাদের ধন্যবাদ দিচ্ছি। মাহারাজা আমাকে যে আমন্ত্রণ দিয়ে পাঠালেন, তার মধ্যে আমি আমার কর্ত্তব্যের নতুন পথ দেখতে পেলাম। সে যেন স্বয়ং বুদ্ধদেবের আমন্ত্রণ, তিনি যেন ডাক দিলেন তাঁর সদ্ধর্ম্মকে উদ্ধার করবার জন্যে। সেই ডাক শুনে আমি আমার প্রিয় কার্য্যক্ষেত্র বিক্রমশিলা ছেড়ে এলাম। এখন সকলকার সমবেত চেষ্টায় ও সাহায্যে আমি কাজ আরম্ভ করব। আশা করি আমি বৌদ্ধধর্ম্মকে নতুন জীবন দিয়ে যেতে পারব।"

আচার্য্যদেব আসন গ্রহণ করলে, সবাই বলে উঠল

"জয় আচার্য্যদেবের জয়।"